‘নিরপেক্ষ রেফারি’ – প্রয়োজন কিন্তু যথেষ্ট নয়

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম

বিএনপি-জামাত জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। গণআন্দোলনের মুখে আগেই গদি ছাড়তে বাধ্য না হলে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এই সরকার ক্ষমতায় থাকতে পারবে। তখন বা তার আগে তাকে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে তিন মাসের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে নতুন নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে। এভাবেই, তিন মাস মেয়াদী একটি অন্তবর্তীকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনাধীনে পরিচালিত নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বর্তমান বিএনপি জোট সরকারের হাত থেকে নির্বাচিত নতুন সরকারের হাতে ক্ষমতার চুড়ান্ত হাতবদল হবে বলে কথা রয়েছে।

রাষ্ট্রক্ষমতা এবার শেষ পর্যন্ত কার হাতে যাবে, এই ইস্যুটি তাই স্বাভাবিক কারণেই এখন রাজনীতির অন্যতম মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। সে কারণেই, যেহেতু তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দায়িত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে থাকবে, তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন, কার্যপরিধি, ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয় এখন রাজনৈতিক দল ও সেই সাথে দেশবাসীর মনযোগের একটি প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে।

একটি নিরপেক্ষ কর্তৃত্বের অধীনে যাতে নির্বাচনের কাজটি পরিচালিত হতে পারে সেই লক্ষ্য থেকেই ১৯৯৬ সালে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জনগণ সংগ্রাম করে এই দাবি প্রতিষ্ঠা করেছে। জনগণ দেখতে চায় যে, সেভাবেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হোক এবং তার দায়িত্ব সে সেভাবেই পালন করুক যাতে সেই লক্ষ্য, অর্থাৎ নিরপেক্ষ কর্তৃত্বের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত হয়। তবে একথাও একই সাথে সত্য যে, নির্বাচনের কাজটি প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হওয়ার কথা নির্বাচন কমিশনের দ্বারা। নির্বাচন কমিশন একটি স্থায়ী সাংবিধানিক সংস্থা। নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যাপারটি তাই একাধারে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন নিরপেক্ষ ভুমিকা এবং সেই সাথে নির্বাচনকালে কর্তৃত্ববান সরকারের তথা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষ ভুমিকার ওপর নির্ভরশীল। এই দু’টি কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার নিরপেক্ষ ভুমিকাকে আরো নিখুঁত ও প্রশ্নমুক্ত করার জন্য প্রচলিত বিধি-বিধান সংস্কারের দাবি উত্থাপিত হওয়াটা তাই মোটেই অস্বাভাবিক বা যুক্তিহীন নয়, বরঞ্চ ‘নির্বাচনের’ নামে বর্তমানে যে ধরনের কাণ্ডকারখানা চলছে তাতে বরং, শুধু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সংস্কারই নয়, গোটা নির্বাচন ব্যবস্থারই মৌলিক সংস্কারের দাবি করাটা খুবই যুক্তিসঙ্গত।

নির্বাচনের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ভুমিকা হলো খেলার ‘রেফারির’ মতো। নির্বাচনে রেফারির নিরপেক্ষতা, অর্থাৎ ‘নিরপেক্ষ রেফারি’র ব্যবস্থা নিখুঁত করার জন্য ১০/১২ বছর ধরেই, অর্থাৎ বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয় সরকারের আমলেই সিপিবি, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, ১১ দলসহ প্রভৃতি দল ও জোটের পক্ষ থেকে নানা সুপারিশ ও দাবি তোলা হয়েছে। এতোদিন যদিও আওয়ামী লীগ এসব দাবি সম্পর্কে কোনো উচ্চবাচ্য করে নি, কিন্তু অবশেষে মাস কয়েক আগে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোটের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংস্কারে ৩১ দফা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। তাদের এই ৩১ দফা প্রস্তাবে প্রধানত ‘নিরপেক্ষ রেফারি’র বিষয়টিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এইসব প্রস্তাবের দু’একটি বিষয়ে কারো কোনো ভিন্ন মত থাকলেও সামগ্রিকভাবে সেগুলো সম্পর্কে, ‘নিরপেক্ষ রেফারি’র অধীনে নির্বাচন প্রত্যাশী কোনো ব্যক্তির পক্ষে, একমত না হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। অথচ উত্থাপিত সংস্কার প্রস্তাবগুলো সম্পর্কে সরকার সে ধরনের মনোভাব গ্রহণ না করে শুরুর দিকে ‘সংস্কারের প্রয়োজন নেই’, ‘সংস্কারের প্রস্তাব উদ্দেশ্যমুলক’ এসব কথা বলে তাদের অগণতান্ত্রিক, চাতুর্যপূর্ণ ও দুরভিসন্ধিমুলক মনোভাব প্রকাশ করেছে। তাদের সেই মনোভাব তারা আজো সম্পূর্ণ বদল না করলেও নানা চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোটের সাথে (সিপিবি ও বাম জোটের সাথে না হলেও) সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে সংলাপের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তা নিয়ে চিঠি চালাচালির অধ্যায় সুচনা করেছে। এভাবে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের সামগ্রিক ইস্যুটি আওয়ামী

লীগের দ্বারা মুলত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা, অর্থাৎ ‘নিরপেক্ষ রেফারি’র প্রশ্নের মাঝে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। আর জোট সরকার সেই ‘নিরপেক্ষ রেফারি’র প্রশ্নটিও কায়দা করে ধামাচাপা দেয়ার জন্য নানা কসরত করে যা"ছে। চিঠি চালাচালি ও সংলাপের বিতর্কের মধ্যে মানুষের দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে কালক্ষেপণ করার কৌশল তারা গ্রহণ করেছে বলে মনে হ"ছে। সাধারণ মানুষের শঙ্কা, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সেই চিঠি চালাচালি, ড্রাফটিং কমিটি গঠন–এসব মুখরোচক অথচ অপ্রধান ও আনুসাঙ্গিক বিষয়ে মুল ইস্যুটিকে আটকে ফেলার সরকারি ফাঁদে কিছুটা হলেও পরে গেছে।

কিন্তু ‘অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচনের’ জন্য সংলাপ, চিঠি চালাচালি এগুলো মোটেই প্রধান প্রাসঙ্গিক বিষয় নয়। এমনকি ‘নিরপেক্ষ রেফারি’র বিষয়টি খুব গুর"ত্বপূর্ণ হলেও সেটাও বর্তমানে একমাত্র বা মুখ্য বিষয় নয়। কারণ, রেফারি যদি নিরপেক্ষ হয়ও, কিন্তু কার্যকর খেলোয়ার হওয়ার সুযোগ যদি বিত্তবান কোটিপতিদেরই থেকে যায়, তাহলে নির্বাচন খুব বেশি হলে ‘কোটিপতিদের মধ্যে নিরপেক্ষ প্রতিযোগিতা’ হয়ে উঠতে পারবে, কিন্তু তা কোনভাবেই সম্সূর্ণ নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচন হবে না। কোটিপতিরা এবং তাদের স্বার্থ রক্ষাকারী দলগুলো সেকারণেই নিরপেক্ষ রেফারির কথা সুবিধামতো বললেও (বিরোধী দলে থাকলে তারা সে কথা খুব জোর গলায় বললেও সরকারে থাকলে তারা সে কথাতো আর বলবেই না, বরঞ্চ বিরোধিতা করবে) নির্বাচন ব্যবস্থার মৌলিক গলদ দুর করার জন্য আমুল সংস্কারের কথা তারা বলছে না এবং বলবেও না।

নির্বাচন নিয়ে বর্তমানে গোড়ার সমস্যাটা আসলে কি? নির্বাচনের নামে সম্প্রতি যে সব কান্ডকারখানা হ"ছে তা বস্তুত এক কুৎসিত টাকার খেলার প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থনীতিবিদরা হিসাব কষে দেখেছেন, দেশে এখন অর্থ বিনিয়োগ করলে সবচেয়ে কম লাভ আসে কৃষিতে, আরেকটু বেশি শিল্পক্ষেত্রে, আরো অনেক বেশি ফটকাবাজি ব্যবসা-বাণিজ্যে, তার চেয়েও কয়েকগুণ বেশি চোরাচালানিতে এবং অন্য সবকিছুর চেয়ে বহু বহু গুণ বেশি ‘এমপিগিরি’তে। পাটের ব্যবসা, চামড়ার ব্যবসা– এসবের চেয়েও নাকি ‘এমপি-ব্যবসা’র লাভ অনেক বেশি এবং এই লাভ অনেক নিশ্চিত এবং তা উঠেও আসে অনেক দ্র"ত। নিজের টাকা বিনিয়োগ করে কিংবা ‘নেতা’র পেছনে ‘রেস খেলায় টাকা বাজি রাখা’র মতো করে লুটেরা ধনিকরা এমপি-ব্যবসার মুনাফার ধান্ধায় পাগলের মতো পরস্সরের বির"দ্ধে অন্ধ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হ"ছে। লুটপাটের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে এই প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বই নির্বাচন ও রাজনীতির চলতি পরিমণ্ডলে চোখে পরা বড় বড় সব দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে। নির্বাচনের নামে শুর" হয়েছে, একদিকে টাকা ওয়ালাদের ঘোড়দৌড়ের জুয়া খেলা, আর অন্যদিকে টাকাওয়ালাদের হাত করার জন্য বড় বুর্জোয়া দলগুলোর (প্রধানত দু'টি বড় দলের) প্রাণান্কর টানাটানি, দৌড়-ঝাঁপ, তৈল-মর্দন। এসব দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীরা নমিনেশন নিতে গেলে তাদের শুনিয়ে দেয়া হ"ছে ‘তোমরা সংগ্রাম করার জন্য, জেল খাটার জন্য উপযুক্ত বটে, কিন্তু ভোটে দাঁড়ানোর জন্য তোমরা অনুপযুক্ত, আনফিট’।

প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি দুই দল মরিয়া প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হ"ছে নির্বাচনের সময় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের নিজ নিজ পক্ষে টানা ও তাদের সহানুভুতি পাওয়ার জন্য। নির্বাচন কার্যত হয়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসর দেশীয় লুটেরা ধনিকদের মন জয় করার জন্য দুই পক্ষের প্রতিযোগিতা। নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাত করতে পারার কাজটি নিয়েও চলছে দুই পক্ষের লড়াই। নিলামে ডাক ওঠার মতো করে চলছে ‘নেগোসিয়েশন’। যে দল বা প্রার্থী এসব কাজ ভালোভাবে সম্সন্ন করতে পারছে তার পক্ষে পরিচালিত হ"ছে ‘ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং’-এর পরীক্ষিত সব কলাকৌশল। এভাবেই টাকার খেলা ও প্রশাসনিক কারসাজি ম্যানেজ করার কম্সিটিশন দিয়ে নির্বাচনের ফলাফল আগেই নির্ধারিত হয়ে যা"ছে। মাঝে শুধু ব্যবস্থা করতে হয় জনমত জোগাড়ের চোখ ধাঁধানো ‘শো-ডাউনের’ ক্যাম্সেইন। সেটাও আরেকটা কোটি টাকার কারবার। জনমত এখন আর কষ্ট করে ‘গড়ে তুলতে’ হয় না, সেটাকেও এখন পয়সা খরচ করে ‘কিনে নেয়ার’ বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। সেই সাথে অবশ্য হাত করতে হ"ছে মাস্তান, ক্যাডার প্রভৃতি পেশিশক্তির উৎসগুলোকে। ‘নির্বাচন’ যেনো হয়ে উঠেছে লাঠিয়াল নিয়ে চর দখলের এক বর্বর অভিযান।

নির্বাচনের মতো অতি গুর"ত্বপুর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটিকে আজ মুনাফালোভি লুটেরা দানবরা লাভ-লোকসান, দেনা-পাওনা, বিনিয়োগ-মুনাফা ইত্যাদির বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে পরিণত করে ফেলেছে। এ সবই হ"ছে 'বাজার অর্থনীতি'র দর্শনের অবধারিত ফলাফল। 'বাজার অর্থনীতি' থেকে জন্ম নিয়েছে 'বাজার রাজনীতি'। ব্যবসায়ীরা রাজনীতি করা শুর" করেছে, আর রাজনীতিকরা শুর" করেছে ব্যবসা। এই দুই প্রবণতার মিলনে জন্ম নিয়েছে 'ব্যবসায়িক রাজনীতি'। জনমত এখন আগের মতো কষ্ট করে গড়তে বা সংগঠিত করতে হয় না, জনমত এখন বাণিজ্যিকভাবে 'কিনতে' পাওয়া যায়। 'রেন্ট-এ কারের' ব্যবসার মতো এখন 'রেন্ট-এ ক্রাউড' ব্যবসাও গড়ে উঠেছে। জনসভার জন্য, মিছিলের জন্য লোক ভাড়ার রেডিমেইড ব্যবস্থা এখান থেকে করা হয়। লুঙ্গি পরা ক্রাউড, প্যান্ট পরা ক্রাউড, মহিলা ক্রাউড– নানা কিছিমের ক্রাউড এখন ক্যাটারারের মাধ্যমে ভাড়ায় পাওয়া যায়। ডেকোরেটরের চেয়ার, টেবিল, প্লেট, ডিস ইত্যাদির ভাড়ার রেইটের মতো এসব নানা ধরনের 'ক্রাউডে'র জন্যও এক এক রকম রেইট আছে। সবকিছুই ক্যাটারিং সার্ভিস হয়ে উঠেছে। এসবই হলো 'চলতি হাওয়ার রাজনীতি', 'নির্বাচন' ইত্যাদির বর্তমান আসল চেহারা। এই 'চলতি হাওয়ায়' গা ভাসিয়ে, তার ভেতরে ঢুকে, মন্দের ভাল নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে রাজনীতি ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান এই ভয়াবহ দুষণ দুর করার কোনো সুযোগ যে নেই, তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজন আছে কি?

নির্বাচনকে নিরপেক্ষ ও অর্থবহ করতে হলে তাই প্রয়োজন গোটা নির্বাচন ব্যবস্থাটিকে ঢেলে সাজানো। 'নিরপেক্ষ রেফারি' আর কিছু উপর ভাসা সংস্কারের প্রসাধন দিয়ে পরিস্থিতির কিছুটা অগ্রগতি ঘটানো হয়তো যাবে, কিন্তু তাতে গোড়ার সমস্যা দুর হবে না। নিরপেক্ষ রেফারির পাশাপাশি যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো নির্বাচনকে টাকার খেলা, পেশিশক্তির নিয়ন্ণ, প্রশাসনিক কারসাজি ও সাম্প্রদায়িক প্রচারণার ধুম্রজাল থেকে মুক্ত করা। শুধু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ক্ষেত্রেই নয়, সংস্কার প্রয়োজন গোটা নির্বাচন ব্যবস্থার। এবং সে সংস্কার হতে হবে মৌলিক ধরনের। নির্বাচন প্রক্রিয়ার সব ক্ষেত্রে আনতে হবে গভীর ও মৌলিক ধরনের নানা পরিবর্তন। শুধু তত্ত্ব কথা নয়, প্রতিটি সমস্যাকে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সুপারিশ প্রণয়ন ও তার বাস্বায়ন করতে হবে। যেমন ধরা যাক নির্বাচনের প্রতিনিধিত্ব-ব্যবস্থার কথা। এ ক্ষেত্রে আমরা যে ব্যবস্থা বর্তমানে অনুসরণ করছি তা গ্রেট ব্রিটেনে থাকলেও, ইউরোপের অন্যান্য বেশিরভাগ দেশে চালু আছে এক ভিন্ন, তথা 'সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' ব্যবস্থা। বাংলাদেশে বর্তমানে চালু রয়েছে 'পৃথক পৃথক কনস্টিটুয়েন্সি ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ও অন্য সবার চেয়ে এগিয়ে থাকার ভিত্তিতে বিজয়ী'–ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার বদলে চালু করতে হবে, 'জাতীয় ভিত্তিক সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা'। এই ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের কর্মসুচি নিয়ে সমস্ দেশবাসীর সামনে সমর্থন– প্রত্যাশী হিসাবে হাজির হতে হবে এবং ভোটে যে দল ও দলের কর্মসুচি যতো অংশ মানুষের সমর্থন পাবে, সংসদেও তারা সেই আনুপাতিক সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠানোর অধিকার পাবে। আগে থেকে ঘোষিত নারী-পুর"ষ প্রতিনিধিদের তালিকা থেকে সমান-সমান সংখ্যক প্রতিনিধি সিরিয়াল অনুযায়ী সংসদে সেই আনুপাতিক সংখ্যক আসন গ্রহণ করার অধিকারী হবে। জাতীয় সংসদের সদস্যরা গোটা দেশের আইন প্রণয়ন ও কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রশাসনের কাজ নিয়ন্ণ করবে। জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম তথা স্থানীয় পর্যায়ের কাজে তারা নাক গলাবেন না। এসব যাবতীয় কাজ-কর্ম স্ব-স্ব স্বশাসিত নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে। 'নির্বাচন ব্যবস্থার আমুল সংস্কারের' ক্ষেত্রে 'সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের' ব্যবস্থা চালু সাপেক্ষে, একই সাথে নির্বাচনী ব্যয় কমিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে সব নির্বাচনী খরচ সরকারি কোষাগার থেকে বহন করার ব্যবস্থা করতে হবে। ঋণখেলাপি, কালো টাকার মালিক, '৭১-এর যুদ্ধাপরাধী, স্বাধীনতা-বিরোধী, রাজাকার প্রভৃতিদেরকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে। সক্রিয়ভাবে ৩ বছর দলের সদস্য হিসাবে কাজ না করলে দলীয় মনোনয়ন প্রদান নিষিদ্ধ করতে হবে এবং সামরিক-বেসামরিক চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর ৫ বছর অতিক্রান্ত না হলে প্রার্থী হওয়ার জন্য অযোগ্য বিবেচনা করতে হবে। সাম্প্রদায়িক প্রচারণা সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে। এসব মৌলিক ধরণের সংস্কার প্রস্তাবনা কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচন সংস্কারের ৫৩ দফা সুপারিশমালায় হাজির করা হয়েছে।

এইসব দাবি নিয়ে এক দশকের বেশি সময় ধরে সিপিবি, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, ১১ দল সংগ্রাম করে চলেছে। সেই সংগ্রাম আরো এগিয়ে নিতে হবে। সরকার যদি আওয়ামী লীগের ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব পুরোপুরি মেনেও নেয় তাহলে তাতে 'নিরপেক্ষ রেফারি'র ব্যাপারে কিছুটা হলেও অগ্রগতি হবে ঠিকই, কিন্তু তাতে টাকার খেলা, পেশিশক্তির নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসনিক কারসাজি ও ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সাম্প্রদায়িক ধুম্রজালের ষড়যন্ত্র যেহেতু বন্ধ হবে না, সে কারণেই নিরপেক্ষ অর্থবহ নির্বাচনের জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তাও শেষ হবে না। 'নিরপেক্ষ রেফারি'র দাবি আদায় হলেও, নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্ধারণ করার কার্যকর ব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের মূল মর্মবাণী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশবাসীকে গোটা নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জন্য ৫৩ দফা আদায়ের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

রচনা : এপ্রিল-২০০৬

'সুশীল সমাজ' ও 'সৎ যোগ্য প্রার্থী আন্দোলন' প্রসঙ্গে

মুজাহিদুল ইসলাম

সৎ-যোগ্য প্রার্থীর ইস্যুটি সম্প্রতি মিডিয়াতে বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এ বিষয়টি নিয়ে অবশ্য দেশের বামপন্থী ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো অনেক বছর ধরেই কথা বলে আসছে এবং সংগ্রামও করে চলেছে, কিন্তু এতোদিন মিডিয়া সে কথা তেমন গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করার প্রয়োজন অনুভব করেনি। ভাবটা যেন এমন যে, এসব তো নীতি-আদর্শের কথা। আর কমিউনিস্টরা এসব নীতি-আদর্শের তত্ত্বকথা তো বলবেই। বুর্জোয়া সাংবাদিকতার পণ্ডিতেরা যেভাবে বলেন যে, 'কুকুর মানুষকে কামড়ালে সেটার কোনো নিউজ ভ্যালু নেই; কিন্তু মানুষ কুকুরকে কামড়ালে সেটা একটা সংবাদ বটে এবং তার একটা নিউজ ভ্যালু আছে।' ঠিক যেন সে কথা অনুসরণ করেই যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছে যে, 'সৎ লোকের পার্টি সিপিবি তো সৎ প্রার্থীর কথা বলবেই, এটা আবার কোনো খবর হলো না কি? এর আবার কোনো প্রচার মূল্য আছে না কি?' তাই কমিউনিস্টরা দিনের পর দিন সৎ ও যোগ্য প্রার্থীর ইস্যু নিয়ে যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, প্রচার মাধ্যমে তা তেমন জায়গা পায়নি। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি হৈ-চৈ উঠেছে এ কারণে যে, এ নিয়ে সম্প্রতি ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কথা তুলেছে যারা, তারা সেসব মার্কামারা কমিউনিস্ট বা বামপন্থী নয়, তারা হচ্ছেন প্রভাবশালী, বিদ্যাধর ও প্রতিষ্ঠিত একদল ভদ্রলোকের সমন্বয়ে গঠিত ও 'সুশীল সমাজ', (ইংরেজিতে সিভিল সোসাইটি)।

গত মাসে ঢাকার একটি পাঁচতারা হোটেলের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলরুমে সুশীল সমাজের বেশ কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি এক সভায় মিলিত হয়ে 'সৎ ও যোগ্য প্রার্থী আন্দোলন' শুরু করার ঘোষণা দিয়েছেন। সভায় বক্তাদের কেউ কেউ এই আন্দোলনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সাংগঠনিক কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে তাদের পরিকল্পনা তুলে ধরেছেন। মজার ব্যাপার হলো, এই সভার পরপরই 'সুশীল সমাজ' বলে দাবিদার গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরই অপর একটি অংশ ওই সভার সিদ্ধান্ত ও বক্তৃতার বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনামূলক প্রবন্ধ পত্রিকায় লিখতে শুরু করে দিয়েছেন। আবার 'সৎ ও যোগ্য প্রার্থী আন্দোলন'-এর পক্ষ নিয়েও একের পর এক পাল্টা লেখা ছাপা হচ্ছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে পাল্টা-পাল্টি ও পরস্পর বিরোধী যুক্তি-তর্ক ও তীব্র সমালোচনামূলক প্রবন্ধাদি পত্রিকার পাঠকরা আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করছেন। রাজনৈতিক দলের মধ্যে পারস্পরিক তর্ক-বিতর্ক দেখে অভ্যস্ত দেশবাসী এবার অবাক বিস্ময়ের সাথে অবলোকন করছে জাতির বিবেক বলে

কথিত, বিবেকের মতোই অবিভাজ্য এক ও অদ্বিতীয়, নিষ্কলুষ ও মহাপবিত্র সুশীল সমাজের মধ্যেই, 'সুশীল সমাজ' বনাম 'সুশীল সমাজ' বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব। সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে! সমগ্র বিষয়টা নিয়ে গোটা কয়েক প্রশ্ন উত্থাপন করা তাই এখন খুবই যুক্তিযুক্ত হবে।

প্রথম কথা হলো 'সুশীল সমাজ' জিনিসটা কি? ভাবসাব দেখে মনে হ'ছে, এ প্রশ্নের পরিষ্কার একটি উত্তর দিতে সুশীল সমাজ মোটেই রাজি নন, কারণ এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে গেলে যুক্তি-তর্কের ফাঁদে পড়ে তারা নিজেরাও কখনো সুশীল সমাজের সংজ্ঞা সম্পর্কে একমত হতে পারবেন না এবং অন্য সবাইকেও একমত করাতে পারবেন না। যেমন– যদি ধরা হয়, সুশীল সমাজ হলো সামরিক শক্তি ও বাস্তবতা বহির্ভূত একটি সত্তা, তাহলে নিশ্চয়ই মন্ত্রী, এমপি, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়নসহ সব অসামরিক সংগঠন ও ব্যক্তিকে সুশীল সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু এটা সবাই মানবে কি? কিংবা যদি বলা হয় যে, সুশীল সমাজ হলো রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও সরকারের বাইরে অবস্থানরতদের একটি সত্তা, তাহলে তো বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে সুশীল সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নিতে হয়। অথবা সুশীল সমাজ বলতে যদি রাজনীতি বহির্ভূত শক্তিকে ধরা হয়, তাহলে তো সামরিক বাহিনীকেও সুশীল সমাজের অংশ বলে বিবেচনা করতে হয়। আবার যদি বলা হয় যে, রাষ্ট্র, প্রশাসন, প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক দল এসবের বাইরে যারা আছেন, শুধু তাদের নিয়ে সুশীল সমাজ গঠিত, তাহলে– যারা পরোক্ষভাবে প্রশাসনের নানা কার্যকলাপে নানাভাবে জড়িত অথবা যারা বিদেশী রাষ্ট্রের অর্থপুষ্ট নানা সংস্থা বা এনজিও'র জাদরেল পরিচালক-কর্মকর্তা কিংবা যারা সারা জীবন বা জীবনের বড় সময় রাজনৈতিক দল করেছেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলেন, সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন, সামরিক কর্মকর্তা বা সচিব ছিলেন, তারা সবাই যে 'সুশীল সমাজের' বাইরের মানুষ, সে বিষয়ে কি জোর আপত্তি উঠবে না? অবশ্য এ বিষয়ে একমত হওয়ার পরেও কেউ দাবি করতে পারেন যে, এসব ব্যক্তি দায়িত্ব থেকে অবসর নেয়ার পর তাদের সুশীল সমাজ হয়ে উঠতে আর বাধা থাকে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে আবার প্রশ্ন দাঁড়ায়, এসব কাজে নিয়োজিত থাকা হোমরা-চোমরারা অবসর নেয়া মাত্রই কোন মায়ার কাঠির স্পর্শে সুশীল সমাজের বহির্ভূত অবস্থান থেকে রাতারাতি সুশীল সমাজের সদস্য হয়ে উঠতে পারলেন? এসব প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই উপর তলার এলিট সমাজের এ ধরনের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা আজ স্বঘোষিতভাবে সুশীল সমাজের সদস্য বনে বসে আছেন!

ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক সাহিত্যে সুশীল সমাজের বিষয়টি বহুল আলোচিত ছিল। বিংশ শতাব্দীতেও বিষয়টি নানাভাবে বিবেচিত হয়েছে। সে সময়ে সুশীল সমাজের ধারণার দ্বারা সেই সামাজিক সত্তাটিকেই বুঝানো হতো, যা কিনা স্বতঃস্ফূর্ত নানারূপ সামাজিক বন্ধন হিসেবে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মাঝে ক্রিয়াশীল। চিন্তা-চেতনা, আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ–এসবের মাঝেই অর্থনৈতিক-সামাজিক বাস্তবতার স্বতঃস্ফূর্ত নানা অভিপ্রকাশ রূপে সুশীল সমাজের অস্তিত্ব প্রকাশিত। সুশীল সমাজের উপাদান ও বৈশিষ্ট্যগুলো কোনো প্রত্যক্ষ সচেতন প্রয়াসের দ্বারা তৈরি হয় না, তা অস্তিত্বমান হয়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। মার্কসবাদীরা সেক্ষেত্রে অবশ্য একথাটি যোগ করে দিয়ে বলেন যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশমান এসব চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ সবই হ'ছে চূড়ান্ত বিচারে বিদ্যমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, কাঠামো ও কার্যকলাপের অভিপ্রকাশ। মার্কসবাদীদের উল্লিখিত ব্যাখ্যাটি গ্রহণ না করলেও ধরে নিতে হয় যে, সুশীল সমাজের ব্যাপারটা নিতান্তই সামাজিক বাস্তবতা ও কর্মকাণ্ডের একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ মাত্র। এই ধারণা মতে তাই, সুশীল সমাজ ব্যাপারটি তৎক্ষণাৎই নাকচ হয়ে যায়, যখন কেউ সুশীল সমাজের নামে সচেতন ও সংঘটিত কর্মকাণ্ড এবং তার স্বপক্ষে স্থায়ী ধরনের সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়। 'সংঘটিত স্বতঃস্ফূর্ততা' যেমন দুই পরস্পর বিরোধী বিপরীতের কারণে অসম্ভব ও অবাস্তব, সোনার পাথরবাটি যেমন একটা ভাওতা, ঠিক তেমনই সুশীল সমাজের নামে কমিটি গঠন, আন্দোলন পরিচালনা, দাবিনামা পেশ, স্থায়ী সাংগঠনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিও একটি চরম ভ্রান্তি বিলাস বা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

এতকিছুর পর আরেকটি গুরুতর প্রশ্ন হলো, সুশীল সমাজের মুখপাত্র বলে দাবী করার অধিকার রাখে কারা? সুশীল সমাজের যতগুলো সম্ভাব্য সংজ্ঞার কথা এর আগে বলা হয়েছে তাতে সবক্ষেত্রেই ১৪ কোটি দেশবাসীর মধ্যে ১৩ কোটির বেশি মানুষকে সুশীল সমাজের সদস্য বলে ধরে নিতে হয় এবং তারা প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই সমমর্যাদা সম্পন্ন সদস্য। সুশীল

সমাজের নিশ্চয়ই কুলীন এবং অকুলীনের জাত-ভেদ থাকতে পারে না। তাহলে সুশীল সমাজের মুখপাত্র হিসাবে দাবি করতে হলে এবং তাদের মুখপাত্র হিসাবে কিছু বলতে হলে সেই ১৩ কোটি সদস্যের মতামতটা নিশ্চয়ই আগে গ্রহণ করতে হবে। অথচ এই কাজটির বালাই না করেই অনেকে সুশীল সমাজের মুখপাত্র হিসাবে নিজেদেরকে জাহির করছেন। পত্রিকায় জানতে পারলাম 'নাগরিক কমিটি ২০০৬' নামক স্বঘোষিত সুশীল সমাজের কর্মকর্তারা তাদের নানা পরিকল্পনার মাঝে এ পরিকল্পনাও ঘোষণা করেছেন যে, তারা বিভিন্ন স্থানে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অঞ্চলভিত্তিতে নাগরিকদের সাথে (জনতার সাথে) সংলাপ করবেন। একথা দিয়ে এই ধারণাই তারা প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, তাদের চিন্ায় 'সুশীল সমাজ' ও 'জনগণ' দুটি পৃথক বিষয়, আলাদা আলাদা স্বতন্ দুটি সত্তা। তাহলে বলতে হয় যে, তাদের মতে সুশীল সমাজ বলতে সমগ্র জনগণকে বোঝায় না, সুশীল সমাজ হলো জনগণের সচেতন 'এলিট' অংশমাত্র। তারাই হলো 'সাবজেক্ট' অর্থাৎ প্রয়োগকারী। আর জনগণ হলো 'অবজেক্ট' অর্থাৎ যার উপর প্রয়োগ করা হবে। জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য এই জনগণকে 'মানুষ' করার দায়িত্ব তাই এসব 'ভদ্রলোক' এলিটদেরকেই নিতে হ'ছে। কিন্তু, সুশীল সমাজের মুখপাত্র হিসাবে অধিকার ও কাজ করার দায়িত্ব ও অধিকার তাদের ওপর কোথা থেকে নাজেল হলো এবং এ দায়িত্ব ও অধিকার তাদের হাতে কে অর্পণ করলো– সেই প্রশ্নে তারা নির"ত্তর।

এর সাথে আরেকটি গুর"তর প্রশ্ন হলো– আমাদের দেশের মতো একটি শ্রেণী বিভক্ত সমাজে, যেখানে শোষক ও শোষিতের মধ্যে এক বৈরী দ্বন্দ্ব বিরাজমান, সেখানে শ্রেণী নিরপেক্ষ নাগরিক সত্তা বলে কিছু থাকতে পারে না কি? শুধু মার্কসবাদীরাই না, যুক্তিবাদী যে কোনো সমাজ বিজ্ঞানী ও সমাজ বিশ্লেষক এই প্রশ্নের জবাবে বলবে–না, থাকতে পারে না। প্রতিদিন অসংখ্য বাস্ব ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা এই শ্রেণী বিভাজন ও শ্রেণী দ্বন্দ্বের নিয়ত প্রকাশ প্রত্যক্ষ করে চলেছি। শোষকের স্বার্থে যারা বিদ্যমান অর্থনৈতিক-সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে আগ্রহী, কেবল তারাই শ্রেণী বিভাজনের বাস্বতাকে অস্বীকার করে থাকেন। শোষক ও শোষিত হিসাবে সমাজ যেহেতু বিভাজিত, তাই 'শ্রেণী নিরপেক্ষ সুশীল সমাজ' বলেও কিছু থাকতে পারে না। সবচেয়ে গুর"তর প্রশ্ন হিসাবে তাই এটাই সামনে আসে যে, সুশীল সমাজ বলে দাবীদাররা কার পক্ষে? শোষকের নাকি শোষিতের? এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে, শ্রেণী নিরপেক্ষ সার্বজনীনতার ভান করে তারা কি 'সুশীল সমাজের' ধুঁয়াসার আড়ালে দাঁড়িয়ে সচেতন বা অচেতনভাবে আসলে শ্রেণী স্বার্থ সমন্বয়ের বাহক হয়ে বিদ্যমান শোষণমুলক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার স্থিতাবস্থা রক্ষার প্রতিক্রিয়াশীল এক নিষ্ফল প্রয়াসকে কার্যকর করছেন না?

* * * *

দ্বিতীয় কথাটি হলো সৎ ও যোগ্য প্রার্থী আন্দোলন সম্স্লর্কে। রাজনীতিতে বর্তমানে উদ্বেগজনকভাবে বিরাজমান কতগুলো দুরাচার সম্স্লর্কে স্বঘোষিত 'সুশীল সমাজের' রোগ নির্ধারণটা বলা যেতে পারে মোটামুটি সঠিক। কিন্তু রোগ নিবারণে ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে গোড়ার মুল কাজগুলো নিয়ে কিন্তু তাদের মোটেও তেমন কোনো কথা নেই । এর ফলে তাদের উদ্দেশ্য সম্স্লর্কে স্বভাবতই কিছু প্রশ্ন ও সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। এই আশংকা পোষণ করা তাই অযৌক্তিক নয় যে, তাদের এই উৎসাহী ও অনেকের ক্ষেত্রেই আন্রিক প্রয়াস, 'বি-রাজনীতিকরণের' দুরভিসন্ধিসম্স্লন্ন কোনো অশুভ মহল তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ের স্বার্থে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে পারে। বিষয়টি আরেকটু খোলাসা করা যাক।

আমাদের দেশে বর্তমানে পার্লামেন্টারি গণতন্ের ব্যবস্থা চলছে। নির্বাচন, সংসদ, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি হলো এই ব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান। আমাদের দেশের ইতিহাসে পার্লামেন্টারি গণতন্ের এসব উপাদান ও এই ব্যবস্থা বাতিল করে বারবার যা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, তা সামরিক শাসন ও স্বৈরাচার; এবং তার ফলশ্র"তিতে গণতন্ ও গণতান্ত্রিক অধিকার খর্বিত হয়েছে, বিপর্যস্ হয়েছে দেশ-জাতি-জনগণের স্বার্থ। রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রগতিশীল বিপ্লবী পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকলে অন্য কথা, কিন্তু এর অন্যথায়– নির্বাচন, সংসদ, রাজনৈতিক দল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দুর্বল হওয়া মানে সেনাশাসন ও স্বৈরাচারের বিপদ বৃদ্ধি পাওয়া। রাজনীতিতে যে দুরাচার চলছে, তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপাদান তাই খুঁজতে হবে হয় বিপ্লবের মধ্যে, না হয় বিপ্লবের আশু সম্ভাবনা না থাকলে সেই লক্ষ্যকে এগিয়ে নেয়ার জন্য এবং তার

পটভূমি গড়ে তোলার জন্য নির্বাচন, সংসদ ও রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপকে গণমুখী ও উন্নত করার পথ ধরে অগ্রসর হওয়ার মধ্যে।

এসব কারণে, প্রথমেই যে কথাটা সকলকে স্বীকার করে নিতে হবে তা হলো, সৎ ও যোগ্য প্রার্থীর আন্দোলন সফল করতে হলে, আগে না হলেও একই সাথে, সফল করতে হবে 'সৎ ও যোগ্য পার্টির' আন্দোলন। 'পার্টি' যদি সৎ ও যোগ্য হয়, তাহলে 'প্রার্থী'ও সৎ ও যোগ্য হবে–এর চেয়ে সহজ কথা আর কি হতে পারে। বাংলাদেশে সৎ, দেশপ্রেমিক পার্টি আছে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সে রকম একটি পার্টি। সততা, ত্যাগ, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমে পরীক্ষিত সিপিবির মতো এ ধরনের আরো দল আছে। এসব রাজনৈতিক দলকে শক্তিশালী করতে পারলে সৎ প্রার্থীর আন্দোলনও এগিয়ে যাবে। সৎ-যোগ্য প্রার্থীর জন্য ব্যাকুল সুশীল সমাজের সৎ, সজ্জন, শিক্ষিত, চিন্াশীল, দেশপ্রেমিক ব্যক্তিরা এসব দলে যোগ দিলে সেগুলো শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং তাহলে দ্র"তই তারা রাজনৈতিক অঙ্গনের নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হতে পারবে। আর এসব দলের কোনো একটাও পছন্দ না হলে, তারা নিজেরাও তো নতুন সৎ দল গঠন করতে পারেন। আর রাজনৈতিক দলের কাজে সরাসরি যুক্ত হতে আরষ্ঠতা থাকলে, এসব সৎ পার্টিগুলোকে তারা বাইরে থেকে নানাভাবে সাহায্য, সহযোগিতা ও মদদ দিয়ে শক্তিশালী করে তুলতে পারেন। এভাবে 'সৎ পার্টি' গড়ার আন্দোলন এগিয়ে নিতে পারলে এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠা সব সৎ পার্টিগুলো একসাথে একটি মোর্চা গড়ে তুলতে পারলে চলমান রাজনীতির দুরাচার থেকে পরিত্রাণের পথ রচনা করা সম্ভব হবে। সৎ প্রার্থী আন্দোলন সফল করার জন্য এটা হলো একটি নিশ্চিত পথ। আরেকটি বিকল্প পথ হতে পারে, অসৎ বড় দলের কোনো একটাতে ঢুকে পড়ে সেটাকে ভেতর থেকে সৎ করে তোলা। অবশ্য সে সম্ভাবনা আদৌ আছে কিনা, সেটা স্বতন্ বিতর্কের বিষয়। সে যাই হোক, যুক্তি ও লজিকের কথা হলো উল্লিখিত দু'টি পথের মধ্যে কোনো একটিকে গ্রহণের মাধ্যমে কিংবা তার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার কাজের মাধ্যমেই সৎ-যোগ্য পার্টির সমস্যা দুর করে যোগ্য প্রার্থী আন্দোলন সফল করা যেতে পারে। 'সৎ ও যোগ্য পার্টির' আন্দোলন সম্পর্কে নীরব বা উদাসীন থেকে, সৎ রাজনৈতিক দলগুলোকে অসৎ রাজনৈতিক দলের সাথে সমভাবে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে, সব রাজনৈতিক দল সম্পর্কে অসততার ঢালাও অভিযোগ করে 'সৎ ও যোগ্য প্রার্থীর আন্দোলনে' কোনো সুফল বয়ে আনাতো যাবেই না, বরঞ্চ তা অরাজনৈতিক (সামরিক, স্বৈরতান্ত্রিক) পথ গ্রহণে আগ্রহী কুচক্রি মহলকে ষড়যন্ের সুযোগ করে দিবে। যে সুযোগ ইতোমধ্যেই নেয়া শুর" হয়েছে। একটি মহল সুচতুরভাবে 'সুশীল সমাজের সরকার', 'ভদ্রলোকের সরকার', 'মাইনাস টু ফর্মুলা', 'তত্ত্বাবধায়ক জাতীয় সরকার' ইত্যাদির কথা নানা ভাবে বলা শুর" করেছে। কিন্তু এসব ফর্মুলায় সামনে যতই ভদ্রলোকের মুখ থাকুক না কেন, সে ধরনের সরকারের পেছনে, তাদের নিজস্ব বিকল্প রাজনৈতিক সাংগঠনিক শক্তি না থাকার কারণে, সংগঠিত সেনাবাহিনীই প্রধান শক্তির উৎস হয়ে উঠতে বাধ্য, সেটা কেউ চাক আর না চাক। সৎ-যোগ্য প্রার্থীর বিষয়টি আপাদমস্ক একটি রাজনৈতিক ইস্যু, তাই রাজনৈতিক দলের কাঠামোর মধ্যেই যোগ্য প্রার্থী সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। এর বাইরে কোনো সমাধানের পথ খোঁজার অর্থ হবে 'বি-রাজনীতিকরণের' প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ের ফাঁদে পা দেয়া।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি গুর"ত্বপুর্ণ প্রশ্ন হলো, সৎ-যোগ্য প্রার্থী আন্দোলনের লক্ষ্য কি কেবল সৎ ও যোগ্য লোকদের মনোনয়ন নিশ্চিত করা, নাকি লক্ষ্য হলো নির্বাচনে সে ধরণের ব্যক্তিদের বিজয় নিশ্চিত করা? নিশ্চয়ই সবাই স্বীকার করবেন যে, শুধু মনোনয়ন প্রাপ্তিই নয়, নির্বাচনে সৎ-যোগ্য ব্যক্তিদের বিজয় নিশ্চিত করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করার লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হলেই এই আন্দোলনের বাস্ব যৌক্তিকতা ও গুর"ত্ব থাকতে পারে। বর্তমানে নির্বাচনকে যেভাবে টাকার খেলা, পেশিশক্তির নিয়ন্ণ, প্রশাসনিক কারসাজি, ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সাম্প্রদায়িক ধুম্রজালের কালো গহ্বরে আবদ্ধ করে এক ধরণের প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে, তা থেকে নির্বাচন ব্যবস্থাকে মুক্ত করতে না পারলে সৎ-যোগ্য প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত করা যাবে না। তাই, সৎ-যোগ্য প্রার্থী আন্দোলনের সামনে একটি প্রধান কর্তব্য হলো নির্বাচনকে টাকার খেলা, পেশিশক্তির নিয়ন্ণ ইত্যাদি থেকে মুক্ত করার জন্য নির্বাচন ব্যবস্থার আমুল সংস্কারের সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়া। এই কাজটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। সমস্ দেশবাসীকে এই সংগ্রামে টেনে এনে তা সফল করতে হবে। নির্বাচন ব্যবস্থার আমুল সংস্কারের কাজটি সহজে সফল হওয়ার নয়। কারণ দেশের অর্থনীতি ও রাষ্ট্র ক্ষমতায় পাকা আসন করে বসা লুটেরা

কায়েমী স্বার্থবাদী শাসক গোষ্ঠী তা হতে দিতে চাইবে না। নির্বাচনকে তারা টাকার খেলায় পরিণত করে তাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আধিপত্য যেভাবে আজ প্রতিষ্ঠা করছে, তা তারা সহজেই ত্যাগ করতে চাইবে কেন? আমাদের বিজ্ঞ 'সুশীল সমাজ' নির্বাচন সংস্কারের এসব মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে তেমন সো"চার নয় কেন? এ প্রশ্ন ওঠাটা কি মোটেও অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক?

সবশেষে যে কথাটি এ প্রসঙ্গে যোগ করা প্রয়োজন, তা হলো 'সৎ ও যোগ্য প্রার্থীর' জন্য যেমন এগিয়ে নেয়া দরকার 'সৎ ও যোগ্য পার্টি' গড়ার আন্দোলন, তেমনি এসবের জন্য একই সাথে পরিচালনা করা দরকার 'সৎ অর্থনীতি' প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। দেশে চলছে লুটপাটের অর্থনীতি। উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন পরগাছাপরায়ণ ফটকাবাজরা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ও মদদে বহুজাতিক কোম্পানির উ"ি"ষ্ট ভোগ করে দেশের অর্থ-সম্পদ ও রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে। বাজার অর্থনীতি, বাজার রাজনীতির জন্ম দিয়েছে। নির্বাচনকে টাকার খেলায় পরিণত করা হয়েছে। প্রার্থী হতে পারা, এমপি হতে পারা- এসব এখন এক ধরনের অতি কুৎসিত বাণিজ্যিক বিনিয়োগের খেলায় পরিণত হয়েছে। রাজনীতির পণ্ডিতরা অনেক আগেই বলেছেন, 'রাজনীতি হলো অর্থনীতিরই ঘনীভূত প্রকাশ'। দুরাচারের অর্থনীতি রাজনীতির দুরাচার জন্ম দিবে, এটাই স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। সৎ-প্রার্থী ও সৎ-পার্টির জন্য আন্দোলনের পাশাপাশি তাই একই সাথে 'সৎ-অর্থনীতির আন্দোলন' শক্তিশালী করাটা একটি মৌলিক কর্তব্য।

এসব প্রশ্নে স্বঘোষিত সুশীল সমাজের 'যোগ্য প্রার্থী আন্দোলন' নীরব কেন? বাজার অর্থনীতির লুটপাটের ধারা উ"ছেদের সংগ্রাম না করে, নির্বাচনের নামে টাকার খেলা ও বাণিজ্যিক কারবার বন্ধের ব্যবস্থা না করে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি না তুলে, সৎ পার্টিগুলোকে মদদ দিয়ে শক্তিশালী ও নিয়ামক করে তোলার কাজ দ্র"ত এগিয়ে না নিয়ে 'সৎ-যোগ্য প্রার্থীর' আন্দোলন সফল হতে পারে না। শুধুমাত্র 'সুশীল সমাজে'র নিরাপদ আড়ালে বসে ও এসব মৌলিক কাজগুলোকে দৃষ্টি থেকে আড়াল করে যোগ্য প্রার্থী আন্দোলনের নামে যতো 'প্রজেক্টই' হাতে নেয়া হোক না কেন, তা ঘোষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না। দুরাচারের বির"দ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধ সংগ্রামে এবং সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট লুটপাটের অর্থনীতি অবসানের সংগ্রামের বহুমাত্রিক ধারায় যুক্ত হয়েই যোগ্য প্রার্থী আন্দোলন সফল করা সম্ভব। 'সুশীল সমাজের' ব্যানার ওড়ানোর জন্য এভাবে পেরেশান না হয়ে দেশের বুদ্ধিজীবী মহল যদি সেই মুল কাজটিকে নানাভাবে এগিয়ে নেন, সেটাই হবে একটা বড় রকম কাজের কাজ।

সবশেষে একটি বিষয়ে উল্লেখ করে শেষ করবো। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রার্থী-পার্টি-অর্থনীতি–এই তিনটার মধ্যে কোন জায়গায় আগে হাত দিতে হবে? এক্ষেত্রে আগে পরের কোনো ব্যাপার নেই, দুরাচারের সর্বব্যাপী প্রকাশের বির"দ্ধেই যুদ্ধ শুর" করতে হবে এক সাথে। 'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দেব কোথা'–দেশের অবস্থা এখন এরকমটাই। মলমের প্রলেপে আর কাজ হবে না। দরকার অনেক কড়া ওষুধ। আজ প্রয়োজন অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ জীবনের একটি সার্বিক গণতান্ত্রিক বিপ্লবী রূপান্তর। এর চেয়ে কম কিছু দিয়ে কাজের কাজ খুব একটা হবে বলে মনে হয় না।

রচনাকাল : এপ্রিল, ২০০৬